নিজভূমে পরবাসী ও একাত্তরের দেশান্তরী

দিলরুবা শাহানা

ডিসেম্বর মাসের কোন একদিন। মেলবোর্নেরই এক বাড়ীতে দাওয়াত। খাওয়াদাওয়া শেষে কয়েকজন নারীর আলাপে, গল্পে মুক্তিযুদ্ধের কথা উঠলো। কেউ কেউ তাদের ছোটবেলায় ঘটে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর টুকটাক স্মৃতি নাড়াচাড়া করছিলেন। কেউ বা মুক্তিযুদ্ধের উপর দেখা কোন সিনেমা অথবা পড়া কোন বইয়ের কথা বলে যাচ্ছিলেন। একজন একটাও কথা না বলে চুপচাপ বসেছিলেন। অন্য কেউ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন

-আপনি কিছু বললেন নাতো?

-আমি তো তখন স্কুলে; তেমন কিছুই জানি না

আরেকজন রসিকতা করে বললেন

- হযরত মোহম্মদ(সঃ),গ্যালেলিও, সক্রেটিস, শেক্সপিয়ার তারা আমাদের জন্মেরও আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের কথাও কমবেশী আমরা জানি, তাইনা?

এই আলাপচারিতা কানে যাওয়াতে মনে হল যে মুক্তিযুদ্ধের কথা জানার জন্য বয়স লাগে না। নিজে যুদ্ধ যেতে পারে নি, বয়স কম ছিল তাই কোন অভিজ্ঞতা অর্জন হয় নি। তাই বলে নিজের দেশের মুক্তিযুদ্ধকে জানবে না এটা কেমন কথা?

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর কথা নানা বইয়ে নানা ভাষায় বলা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। আপামর দেশবাসীর সেই ভয়ংকরের মুখোমুখী কাটানো নয়মাস ছিল যাতনা আর বিষাদের। তার কতটুকুই বা সবার জানা হয়েছে বা কতটুকুই বা সবাইকে জানানো হয়েছে। একেক জনের এক এক রকম দুঃস্বপ্ন আর কষ্টের মাঝে কাটানো কাল। অনেকরই জানতে মন চায় কার কেমন কেটেছে নয়মাস। কেউ চাইলে জানতেও পারে।

যুদ্ধের সময়ে মার্কিন কবি আলেক্স গিন্সবার্গের ভারতের শরণার্থী শিবির ভ্রমণ শেষে লেখা কবিতা ‘এ্যালং দ্যা যশোর রোড’, মৌসুমী ভৌমিকের গাওয়া গান আছে ওই কবিতা নিয়েই, তারপর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ রুমির মা জাহানারা ইমামের ‘একাত্তরের দিনগুলি’, শব্দসৈনিক এম.আর. আখতার মুকুলের ‘আমি বিজয় দেখেছি’ আরও কত কত কথা ও গাঁথা আমাদের পরিচয় করায় নিষ্ঠুর ও নির্মম বাস্তবতার সাথে।

পশ্চিমা পাকীদের দূরভিসন্ধিমূলক মনগড়া ধারনা আমরা বাঙ্গালীরা যথেষ্ঠ মুসলমান না। তাই ধর্ম রক্ষার বাহানায় আমাদের শায়েস্তা করতে ওরা ঝাপিয়ে পড়ে ১৯৭১ সালের কালো রাত্রে। তারিখটা ছিল ২৬শে মার্চ। ওইদিন সপ্তাহের কি বার ছিল সাধারন মানুষের ততোটা মনে রাখার কথা নয়। তবে সন, মাস, তারিখ জানা ইতিহাসের দাবী তাই ইতিহাসবিদ জানেন অবশ্যই।

তারপরের দিন থেকেই দেশের মানুষ যে যার কর্তব্য ঠিক করে ফেলে। মায়ের ছেলেরা যুদ্ধে যায় মুক্তি ছিনিয়ে আনতে। এদিকে অধিকৃত দেশে ঘরে ঘরে মায়েরা ছোটদের নিয়ে আল্লাহর কাছে দিবারাত্রি দেশের জয়, স্বস্থি ও শান্তি চেয়ে প্রার্থনা শুরু করেন।

মানুষের মুখে শুনে, বইপত্র পড়ে ওই দিনগুলোর কথা বিস্তারিত জানার আগ্রহ অনেকের মত আমারও। ইচ্ছা দুরন্ত ছিল দেখে একজন পরবাসেও ভালবেসে একটা বই পড়তে দিয়েছিলেন আমাকে। বইটি একজন ইতিহাসবিদের রচনা। বইটিতে ২৬শে মার্চ বৃহস্পতিবার ছিল বলে জানতে পারি। পরদিন ২৭শে মার্চ ছিল শুক্রবার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক, গবেষক ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়নের জন্য জন্য গঠিত প্রামান্যকরণ কমিটির সভাপতি ডঃ মফিজুল্লাহ কবীর তাঁর বইতে লিখেছেন ওই শুক্রবারে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থেকেও ঢাকার মসজিদ থেকে জুম্মার আজান ধ্বনি শুনতে পায়নি মানুষ।

কি পরিহাস! ধর্ম রক্ষার নামে ওরা আজানকেই স্তব্ধ করে দিয়েছিল ওই শুক্রবারে। কারফিউ জারী ছিল শহরে। তাতে মুসল্লীদের জুম্মার নামাজে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

পুরো বইতে চাক্ষুষ দৃশ্যগুলো বিবৃত হয়েছে নিখুঁত ভাবে। সততার সাথে নিজস্ব ভীতিকর অনুভূতিও তুলে ধরেছেন ইতিহাসবিদ শিক্ষক। দুঃসহ দূর্গতির দিনগুলোতে কিছু লিখবেন বলে একটি চটি খাতা কিনে এনেছিলেন। তার মলাটে বাংলাদেশের জনক শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ও তার দলের প্রতীক নৌকার ছবি ছিল। লেখকের ভীতসন্ত্রস্ত স্ত্রী তাকে মলাটটি ছিঁড়ে ফেলতে অনুরোধ করেন। কারন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অনবরত পাক আর্মি টহল দিয়ে যাচ্ছিল। ওই দিনগুলোতে আল্লাহর কাছে অধ্যাপক নিজস্ব বাক্যাবলী দিয়ে প্রতি রাতে একটি প্রার্থনা করতেন। প্রতি রাতেই তিনি নিজস্ব বন্দনাটি বাংলায় লিখতেন আবার ছিড়েও ফেলতেন। কারন তখন যে স্বদেশেও মানুষ পরবাসী। তখন দেশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে হানাদার পাকবাহিনী। স্বাধীনতা নাই বাক্যেরও।

ভারতের পশ্চিম বঙ্গের শরণার্থী শিবিরেও দেশ থেকে পলাতক অনেক স্বদেশী ভাইবোনেরা অসহনীয় কাল কাটাচ্ছেন, যোদ্ধারাতো আছেনই। দেশের ভিতরেও মানুষ অস্বাভাবিক রকম স্বাভাবিকতার ভেক ধরে জীবন চালাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ছাত্র নাই, স্কুল-কলেজও খোলা তাতেও নামমাত্র ছাত্র। পাকবাহিনীর সদম্ভ চেষ্টা সব ঠিকঠাক, সব স্বাভাবিক দেখানো আর মুক্তির জন্য মরিয়া মানুষের আপ্রাণ প্রয়াস ওদের সবকিছু ভন্ডুল করে দেওয়া।

ওই নয়মাসের পরবাসে সাবালক, নাবালক, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ সবাই এতো দীর্ঘ সময় জায়নামাজে বসে থেকেছেন, তাসবীহ্ জপেছেন হিসাব করে বের করা যাবে না। প্রার্থনা একটাই মুক্তিযোদ্ধার জয়, দেশের মুক্তি, মানুষের স্বাধীনতা। ডঃ মফিজুল্লাহ কবীরতার বইতে(Experience of an Exile at Home: Life in Occupied Bangladesh) লিখছেন যে ২৬মার্চের পরের বৃহস্পতিবারে পাকবাহিনী ঢাকার কাছে

জিঞ্জিরা অভিযান চালায়। এখানে পুরো বইয়ের কাহিনী বর্ননা নয় লেখকের কিছু কিছু পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করাই উদ্দেশ্য। তাই লেখকের ভাষ্য মুসলমানদের কাছে পবিত্র দিনগুলোকেই তারা হত্যা-ধ্বংস ও নির্যাতন চালানোর জন্য বেছে নিতে দ্বিধা করে নি। তথ্যে ঋদ্ধ বইয়ে নিজভূমে দমবন্ধ করা পরিবেশে ইতিহাসবিদের অনুভূতিও পাঠককে নাড়া দিয়ে যায়।

কিছু ছবি রয়েছে বইটিতে যা থেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নারীপুরুষ নির্বিশেষে জনগণের নিষ্ঠা-নিবেদন যেমন বোঝা যায় তেমনি আন্দাজ করা যায় আমাদের প্রতি পশ্চিমা পাকীদের নিষ্ঠুরতার মাত্রা।

আলবদর, রাজাকাররা যে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল তাঁদের বেশী অংশ ছিলেন শিক্ষক তাদের বিষয়ে তথ্যগুলো নিখুঁত ভাবে আছে এই ইতিহাসবিদের লেখাতে।

এবার অন্য ঘটনা বর্নিত হচ্ছে তাও মুক্তিযুদ্ধেরই অংশ। বিদেশে বসেই শুনা।

একজন স্কুল পড়ুয়া তার পরিবারের সাথে ভারতে শরণার্থী হিসেবে নয়মাস কাটিয়েছিলেন। তার বড়ভাই মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছেন। পরিবার হুমকির মুখে একারনে সীমান্ত সৎলগ্ন এলাকা থেকে তাদের গোটা পরিবার পালিয়ে ভারতে চলে যায়। এপারে তাদের ঘরবড়ী পুড়িয়ে দেয় পাকিস্তানপন্থীরা আর ওপারেও ঘটলো করুণ ঘটনা। তার মায়ের মৃত্যু ঘটে শরণার্থী শিবিরেই। যুদ্ধ শেষে তারা যুদ্ধে বিধ্বস্থ দেশ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত নিজ বাড়ীতে ফিরে আসেন। মা ফিরলেন না সাথে তাই জীবন হল অনেক কষ্টের। তারপরও নানা সমস্যার মাঝ দিয়ে মাতৃহীন ছেলেটি পড়াশুনা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পেশায় যোগ দেয়। তবে তার মনে বরাবর জেগে ছিল ও আছে শরণার্থী শিবিরের দিনযাপনের কষ্ট ও শিবিরেই মাকে হারানোর দুঃখ। সবকিছু ঘটেছিল দেশের দুর্দিনের কারনে।

মুক্তিযুদ্ধের ক্ষত বুকে নিয়ে জীবন যাপনকারী ওই মানুষটি বহুদিন পর একদিন ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তারই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বয়োজ্যেষ্ট ভাইয়ের উপর। জ্যেষ্ট ভাই এমনিতে মানুষ নাকি খারাপ না। তবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার কোন আগ্রহ বা আবেগ দেখা যেতো না। একদিন সেই ভাইয়ের এক মন্তব্য শুনে দুঃখ আর ক্রোধে ফেটে পড়লেন শরণার্থী শিবিরে মা হারানো লোকটি। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন

-ভাই আপনাকে আপনার কথা উইথড্র করতেই হবে; সবাই মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতে গিয়েছিল ফায়দা আর সুবিধা লুটতে আপনার এই কথা একদম ঠিক নয়। বলতে হবে সবাই যায় নি, বলতে হবে মতিয়ুরের পরিবার যায় নি।

শেখ মতিয়ুর নামের সে শিক্ষক মেলবোর্নে বসে তার বিষাদময় এই অভিজ্ঞতা বর্ননা করছিলেন যখন তার চোখে ছিল অসহনীয় দুঃখের ছায়া আর কণ্ঠে ছিল গভীর কান্নামাখানো ক্রোধ।

এই সেই নয়মাসের ইতিহাস যার প্রতি পরতে পরতে গেঁথে আছে আবেগ অহংকার, দুঃখ, ও ভীতিকর অসংখ্য স্মৃতি। স্বদেশ থেকে বহু দূরে বাস করেও টের পাওয়া যায় তার রেশ।